সমান্তরাল

প্রথম

রফিকুর রশীদ

একামত উল্লাহ বেশ কিছু দিন যাবৎ এক বিভ্রমের মধ্যে পড়েছে। ভারি এক গোলক ধাঁধা। ভাবতে ভাবতে মগজের কোষে কোষে ঘোর লেগে যায়। মাটি ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে তার এই বিভ্রম। নিশি পাওয়া মানুষের মতো মাঠ থেকে বাড়ি ফেরে। পাখিকে কাছে ডাকে। তার দু'চোখে ঘোরলাগা চোখ মেলে তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়েই থাকে নির্নিমেষ। সে চোখে গভীর ছায়ার বিস্তার আবিষ্কার করে। জল টলমল শান্ত পুকুরের পদ্মপাতার মতো ভরাট সে ছায়া। স্বামীর অন্তর্জগতের এই সব গোলকধাঁধার সন্ধান পায় না পাখি। তার দু'চোখের পাতা কেঁপে ওঠে তিরতির করে। গাল ফুটো করা টোল ফেলে ফিক করে হেসে সে পালিয়ে যেতে চায়। একামত উল্লাহ দু'বাহু মেলে পথ আগলে দাঁড়ায়, জাপটে ধরে পাখিকে। দিনের আলো তখনো পশ্চিম আকাশের গায়ে রোদের কুসুম ফেটে দিয়ে রীতিমতো নিজের অস্তিত্বে বহাল আছে। সেই রক্তাভ আলোকপ্রভায় পাখি লজ্জা পায় এবং বিস্মিত হয় স্বামীর এই অসংযত আচরণে। দু'বাহুর খাঁচায় সে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এক সময় হাল ছেড়ে দেয়। তার দেহ শিথিল হয়ে আসে। একামতউল্লাহ তখন পাখিন শান্ত মুখখানি দু'হাতে তুলে ধরে। সেই ঘোর লাগা চোখে তাকায়। কিন্তু পাখির দু'চোখ নিমীলিত। সে আস্তে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে, তাকাও না! চোখের পাতা কাঁপে, কিন্তু পাখি চোখ বুঁজেই থাকে। একামত উল্লাহও আর পীড়াপীড়ি করে না। তখন তার মনে হয়– মাঠ ভর্তি সবুজ ধানের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে, হাওয়ায় দুলে উঠছে ধানের সবুজ পাতা, নধর শীষ, তার বুকের ভেতরে যেন বা এক গোছা ধানের শীষ মাথা নুইয়ে স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে মমতা মদির।

একামতউল্লাহর বাপ রাহমতউল্লাহ ছিল ছিটগ্রস্ত ভূমিহীন কৃষক। সে যে যথার্থই ভূমিহীন ছিল এ কথা জানতে একামতউল্লাহকে বিশেষ কোনো মেহনত করতে হয়নি। শৈশবে সহজাত বুদ্ধি দিয়েই সেটা জানা গিয়েছিলো। কিন্তু বেশ কিছুটা বয়স হবার পর সে আবিষ্কার করে যে তার বাপের মাথায় ছিট আছে। জমিজায়গার এক মেঠো ভূত দিনরাত তার কাঁধে বসে ঠ্যাৎ নাচায়। মাঠে গিয়ে সবুজ ধানের ঢেউ দেখলে সেই বুড়ো ভূতটা হা হা করে হেসে ওঠে। মাঠের বাতাস কাঁপে সেই হাসির ধাক্কায়। তখন লোকটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। চোখ দুটো কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়। এই রকম ভূতে পাওয়া দশায় শৈশবে কতোদিন একামতউল্লাহকে হাত উঁচিয়ে দেখিয়েছে– 'এই দ্যাক, এই সাড়ে তিন বিঘের দাগটা আমাদের ছিল। এই তো, কদ্দিন আগের কথা।' সত্যি সত্যি কতোদিন আগের কথা সেটা আবার সে কিছুতেই স্মরণ করতে পারে না। বালক একামতউল্লাহ প্রথম দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতো এই সব কেচ্ছা। রহমতউল্লাহর উৎসাহ তখন খই ফোটার মতো টগবগ করে। সুযোগ পেলেই আঙুল তুলে চিনিয়ে দেয়, দাবি করে 'কানপাড়ার এ সাতবিঘের দাগটা আমার দাদা লেইখি দিয়িছিলু আমার বাপ্‌জিকে, তাই নিয়ি ছোট্‌বাপের সে কি দাপাদাপি।' একটু দম নিয়ে শ্রোতার মনোযোগ পরখ করার পর আবার শুরু করে 'আমার বাপ্‌জি হলু বড় ছেইলি। বড় ছেইলিকে বাপে আদর কইরি দেয় না কিছু! তার আবার ভাগ কিসির বোলো দিনি! আমার ছোটবাপ সেই জমিরও ভাগ চায়।' পিতৃবিবরণের এই সুযোগটা কাজে লাগায় একামতউল্লাহ– 'আম্মু তো তুমার বড় ছেইলি, আমাক তুমি কি দিবা বাপ্‌জি?' না, হিসেবে একটু ভুল হলো। পাঁচ মেয়ের পর একামত উল্লাহই তার বাপের একমাত্র ছেলে। একমাত্র ছেলেকেও দিয়ে যাবার মতো জমিজাগা রহমতউল্লাহর আজ আর নেই। ফলে ছেলের এ প্রস্তাব সে না শোনার ভান করে অন্য দিকে উদাস হয়ে তাকায়। একামতউল্লাহ এ সময় মনে মনে হাসে। ভাবে, বাখোয়াজ লোকটাকে বেশ জব্দ করা গেছে। আসলে জব্দ হয় সে একামতউল্লাহর মায়ের কাছে। এ সব সাতকাহনের কেচ্ছা কানে গেলেই সে খিঁচিয়ে ওঠে 'কুন কালে ঘি দিয়ি ভাত খাইয়িচো, অ্যাখুন সাত পুরুষ ধইরি হাত শোকো গা! কিসির এক গাওনা হয়িচে ইডা ছিলু, উডা ছিলু, য্যানে সব আজা-বাদশা ছিলু।'

রহমতউল্লাহ একদিন সাহস করে সে ব্যাখ্যাও দেয় এক গাল হাসি ছড়িয়ে, সত্যিই ছিলু গো আমেনার মা।

প্রথম সন্তান আমেনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে এভাবেই স্ত্রীকে সম্বোধন করে রহমতউল্লাহ। সে হারানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে চলে– 'ঘি খাওয়ার কতা বুলছো। আমরা খাইয়িচি খাঁটি গাওয়া ঘি। এক জোড়া গাইয়ের দুধ, খাবো কতো! বাড়ির দুধির ঘি, আর এ্যাখুনকার বাজারী ঘি, আকাশ পাতাল তফাৎ।'

একামতউল্লাহর মাও কম যায় না। সেও সুযোগ মতো ফোঁড়ন কাটে– 'এঁহ্ এ্যাখুনকার ঘি, বাজারী ঘি! এই ঘিইবা কুন্ কালে খাইয়িচো তুমি?'

সত্যি বটে, ঘি খাওয়ার ঘটনা স্মরণযোগ্য অতীতের স্মৃতিতে নেই। তাই বলে আমেনার মা ঐভাবে বলবে! সে নিজেও কি রহমতউল্লাহর জমিজাগা কিছুই দেখেনি! জমি জাগা, গোয়াল গরু না দেখে তার বাপ মেয়ের বিয়ে দিয়েছে রহমতউল্লাহর সঙ্গে! একামতউল্লাহ এ সবের কিছুই দেখেনি বলেই তাকে মাঠঘাট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানোতে সে এক ধরনের আনন্দ খুঁজে পায়। আজ না থাক, একদিন তো সবই ছিল! একামতউল্লাহর মা তো নেই নেই করেও অনেক কিছুই দেখেছে, তাকে আবার বুঝিয়ে বলতে হবে কেন! আর বলতে গেলেই তো নেড়ি কুত্তার মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে, মুখে বাধে না কিছুই। মায়ের এই অবিশ্বাস থেকেই একামতউল্লাহর সংশয় জাগে নির্ঘাৎ বাপের মাথায় ছিট আছে, জমি জাগার ভূত আছে ঘাড়ে। ঐ সংশয় নিয়েই এক দিন সে জানতে চেয়েছিল– তুমার বাপ দাদার সেই সব জমিজাগা, গরু-বাছুর গেল কনে, কীভাবে গেল?

এ প্রশ্নের জবাব কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারে না রহমতউল্লাহ, গুলিয়ে যায়, বিমূঢ় হয়ে পড়ে। কোথায় গেল, কীভাবে গেল অন্ধকার কালো বেড়াল হাতড়ায়। পানিতে কাদামাটির শক্ত বাঁধ দেখতে পায় ঠিকই, বাঁধের গায়ের চোরা ছিদ্র কিছুতেই চোখে পড়ে না। অথচ পানি বেরিয়ে যায় ঐ চোরা পথেই। কী করে বোঝাবে একামতউল্লাহকে! ছেলেটি হয়েছে বেজায় ডেঁপো। শুধু সন্দেহ তার। শুধু অবিশ্বাস। রহমতউল্লাহ যদি এখনই জানায় মায়ের চিকিৎসা করাতে, মেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়েই জমিজাগা হারিয়েছে, অমনি সে বলবে, 'যারা তুমার জমি নেয়, তাদের মেয়ির বিয়ি হয় না? বিয়ি দিতি গেলি তাদের জমিজাগা হারায় না?' এমন আজগুবি প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

এ সব হারানোর হিসেব অবশ্য একামতউল্লাহও কোনো দিন মেলাতে পারেনি। সেই কারণে বাপের মাথায় নিশ্চিত একটা মেঠো ভূত ছিল– এ রকম ধারণা গড়ে নিয়ে সে স্বস্তি খোঁজে। নিজেকে বুঝ দেয়। কিন্তু বাপের চিনিয়ে দেয়া সেই সব হারানো জমির ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে, সেই পরকীয়া জমির ধানের শীষ শরীর ছুঁয়ে গেলে, একামতউল্লার পায়ের পাতায় অচেনা এক কষ্টের গোপন কাঁটা খচখচ করে বেঁধে। নিজের জমি থাকার ব্যাপারটা কেমন আনন্দের সেই জমিতে নিজের হাতে ফসল ফলানো কেমন অনুভূতির তাই জানতে ইচ্ছে করে।

একামতউল্লাহর এই ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত ফলবতী হয়ে ওঠার সুযোগ পেল গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা হবার পর। প্রথমে গুচ্ছগ্রামের লিস্টে নিজের নাম ওঠার পরও হঠাৎ একদিন শোনা গেল, আদম মেম্বর বেছে বেছে নিজের লোক ঢুকিয়েছে এই অভিযোগে সে লিস্ট বাতিল হয়ে গেছে। শুনে ভয়ানক মন খারাপ হয়ে যায়। ছুটে যায় তহশিল অফিসে। সেখানকার পিওন বিশু আশ্বাস দেয় এখনও সময় আছে, তবে নতুন লিস্টে নাম তুলতে টাকা লাগবে হাজারখানেক। একামতউল্লাহর মাথায় হাত। এতো টাকা কোথায় পাবে সে! সব শুনে পাখি তার কানের দুল খুলে দিল। পাখির গয়নাগাটি বলতে এইটুকুই। উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের কান থেকে তার কানে এসেছে। গরিবের বৌ, গয়না কি করবে! সে অবলীলায় দুলের আঁকড়া খুলে স্বামীর হাতে তুলে দেয়। একামতউল্লাহর খুব খারাপ লাগে স্ত্রীর কাছে হাত পাততে। তবু নিতে হয় গুচ্ছগ্রামে যাবার লোভে। টিনের ঘর, দু'বিঘে চাষের জমি সোজা কথা নয়। একবার বিদ্‌ঘুটে এক ভাবনারও উদয় হয়– জমি জাগার সেই মেঠো ভূতটা তার মরা বাপের কাঁধ থেকে লাফিয়ে তার নিজের কাঁধে চলে এলো না তো! পরক্ষণে সে ভাবনা ঝেড়ে ফ্যালে, হাতের মুঠোয় ধরে রাখা সোনার দুলের উজ্জ্বল প্রভায় চোখ রাখে। তখন মনে হয় অন্ধকারে নিমজ্জিত তার জীবনে এই বুঝিবা আশার আলো।

মাস দুয়েকের হয়রানি, উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা অতিক্রম করে অবশেষে একামতউল্লাহ যেদিন সত্যিই গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা হয়, সে দিন তার খুব বাপের কথা মনে পড়ে। আহা বেচারার জেনে যাওয়া হলো না, তার ছেলে আবার জমি ফিরে পেয়েছে। চাষের জমি। বসত ভিটে। জমিজাগা নিয়ে তার ভারি আদিখ্যেতা ছিল। মাথায় ছিট ছিল। কাঁধে ভূত ছিলো। নিজের হাতে নিজের জমি আবাদের আনন্দের কথা বলতো।

ঘরদোর, জমিজাগা শুধু নয়, গুচ্ছগ্রাম একামতউল্লাহর জীবনে এনে দেয় অপার সম্ভাবনা। নিজে হাতে চষে খুঁড়ে বীজ বুনে সেই জমিতে যখন কচিধানের নধর

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS

চারাগুলো মাঠ জুড়ে পাখা ছড়ায়, তখনই একদিন পাখি লজ্জায় শামুক হয়ে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে জানায়– তাদের দু'বছরের নিষ্ফলা দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটতে চলেছে। নতুন অতিথির আগমন সম্ভাবনায় পাগল হয়ে ওঠে একামতউল্লাহ। পাখির তলপেটে কান লাগিয়ে কী এক প্রত্যাশিত ধ্বনি শুনতে চেষ্টা করে। অতোটা প্রাথমিক অবস্থায় কিছুই শোনার কথা নয়। তবু মনে হয়, সে শুনতে পাচ্ছে, কী এক বিচিত্র ধ্বনি তার কানের দরজায় কড়া নাড়ছে। সেই ধ্বনি কানের সঙ্গে লেপ্টে থাকে। পরদিন মাঠে গিয়ে নিড়ানি হাতে ধানের জমিতে বসতেই আবার সেই ধ্বনি শুনতে পায়। সারা শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। কান খাড়া করে। মৃদু বাতাসে দুলে উঠছে কচি ধানের সবুজ পাতা। স্নেহার্দ্র হাতে সে সবুজ পাতার বুকে বিলি কাটে, পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দেয়, তখনই আবার শুনতে পায় সেই বিচিত্র ধ্বনি। কেমন এক নেশার ঘোর লেগে যায় একামতউল্লাহর মগজের কোষে কোষে। বাড়ি ফিরে আবার পাখির তলপেটে কান পাতে।

প্রত্যাশিত ধ্বনি শুনতে পায় কিনা সেই জানে, দু'হাতে জাপটে ধরে পাখির সারা শরীর। কখনো হাত বুলায় বুকে পিঠে, কখনো বা তার চুলের অরণ্যে বিলি কাটে মমতার চিরুনি হয়ে।

একামতউল্লাহ ক্রমশ বুকের নদীতে ভাঙন টের পায়। কেমন যেন বদলে যাচ্ছে সব কিছু। চারপাশের চেনাজানা অনেক কিছুতেই অচেনা কোনো রঙের ছোঁয়া। ভেতরে ভেতরে কিসের যেন পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। পাখির শরীরে হাত রাখলেই সবুজ ধানের স্পর্শ মেলে। মাঠে গিয়ে ধানের জমিতে নামলেই পাখির কথা মনে পড়ে যায়। ভীষণ এক ঘোরের মধ্যে কাটে তার দিনরাত। সবুজ পাতার বুক চিরে সবেমাত্র ধানের শীষ ছড়িয়েছে। মমতার স্পর্শে নুইয়ে আনে সেই শীষ। দুই আঙুলের পেষণে একটি ধানের পাতলা আবরণ আলগা হয়ে যায়। বেরিয়ে আসে ধবল সাদা দুধ। অবাক বিস্ময়ে আঙুলের ডগায় লেগে থাকা দুধ পরখ করে। লোভী বালকের মতো জিভে ছুঁয়ে স্বাদ নেয়। মাটি তার বুকের সুধা নিংড়ে গাছের শরীর বেয়ে কী ভাবে যে এই অসাধারণ সঞ্চয় পৌঁছে দেয় ভেবে পায় না একামতউল্লাহ। বাড়ি ফিরে রাতে সে কথা জিজ্ঞেস করে পাখিকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে পাখি। কথা বলে না। একামতউল্লাহর ডান হাতের পাঁচ আঙুল তখন পাখির শরীরে তন্নতন্ন করে সন্ধান করে ঐ প্রশ্নের জবাব। গত দু'বছরের চেনা অচেনা সকল অলিগলি সন্ধান করে। পাখির বুকের উপত্যকায় এসে থেমে পড়ে তার সন্ধানী হাত। টিয়ের ঠোঁট হয়ে দু'আঙুলে কুটুস করে চিমটি কাটে পাখির স্তনবৃন্তে। পরম পুলকে পাখির মুখ থেকে একবার শুধু উচ্চারিত হয় উহ্।

একামতউল্লাহ তখনই অনুভব করে কচি ধানের ধবল দুধে ভিজে গেছে তার আঙুলের ডগা। পাখিকে নয়, সে যেন তার বুকের বাসরে ধারণ করেছে পিতৃবর্ণিত তাবৎ হারানো জমি।

তিমা

দ্বিতীয়

সানিয়াত সাত্তার

'বিশ্ব নারী দিবসে আজকের এই বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকের এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হবেন আমাদের সকলের অতি প্রিয় মুখ তিমা রহমান...'

এভাবে অনুষ্ঠান ঘোষিকার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে অতি লাজুক তিমার লজ্জা যেন আরো গাঢ় হচ্ছিল। কিন্তু সেই লজ্জার অভিব্যক্তি যথাযথ হচ্ছে কিনা, তা নিয়েও তিমা যথেষ্ট সন্দিহান।

ফুলের তোড়া, ক্রেস্ট, মডেল আর অফুরন্ত করতালির জোয়ারে যেন তিমার ডুবে যাওয়ার দশা! কাঁধ ফিরিয়ে পাশে বসা মহিলা নেত্রী মিসেস জামিলা আহমেদকে তিমা বললো, 'আপা। একটু যদি পানির ব্যবস্থা...' মিসেস জামিলা করতালির ছন্দে এতটাই তন্ময় ছিলেন যে, তিমার কথাগুলো তার কানে পৌঁছালো না। তিমা উত্তর না পেয়ে আবারো বললো 'আপা। পানি।' সামনের সারিতে বসা একজন দর্শকের ব্যাপারটা চোখে পড়লো। তিনি অকেকটা চিৎকার করেই বললেন, 'এই যে জামিলা ম্যাডাম! তিমা আপা আপনাকে কি যেন বলছেন। দয়া করে উনার কথাটা শুনেন।' দর্শকের চিৎকারে মিসেস জামিলা যেন করতালির জগৎ থেকে বাস্তবতায় ফিরে এলেন।

'তুমি কি কিছু বলছো তিমা?'

'হ্যাঁ আপা, আমাকে এক গ্লাস পানি দিলে বড় কৃতার্থ হবো।'

অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়। সবশেষে সংবর্ধিত তিমা রহমান দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবে। তিমা আস্তে করে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। মিসেস জামিলা বললেন, 'উহু, দাঁড়াতে হবে না। তুমি এখানে বসেই বলো।' তিমা মিসেস জামিলার কথা অগ্রাহ্য করে মঞ্চের এক কোনায় দাঁড় করানো পোডিয়ামের কাছে গেল। একজন লোক এসে মাইক্রোফোনটা তিমার সমান উচ্চতায় এনে ঠিক করে দিল। তিমা তার চোখের কালো চশমাটা সরিয়ে নিলো। পুরো মিলনায়তন জুড়ে পিনপতন নীরবতা। সবাই যেন এই মুহূর্তটার জন্যেই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

দুই ভাই তিন বোনের মধ্যে আমি হচ্ছি তৃতীয়। আমি যেদিন নিম্ন মধ্যবিত্ত এই পরিবারে জন্মালাম, সেদিন নাকি ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার– অমাবশ্যা। জন্ম থেকে অন্ধকার আমার পথ চলার সাথী। তিমির আঁধারের সাথে মিলিয়ে আমার নামটা রাখা হলো 'তিমা'। সবাই বলতো আমি নাকি আমার সব ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ফর্সা। কিন্তু আমার এই ফর্সা চেহারাটা আমি কখনো দেখিনি। সত্যি কথা বলতে কী, ফর্সা কাকে বলে, আলো কাকে বলে... তা'ই আমি জানি না। কিন্তু আলো বা রঙের একেকটা আলাদা চেহারা আমার মনের ভেতর তৈরি করা আছে। আমি ভাবি নীল মানে এই, আর লাল মানে ওই। হয়তো আমার মতো যারা জন্মান্ধ, যারা কখনো রঙ দেখেনি... তারা প্রত্যেকেই এরকম একেকটা ছবি তৈরি করে আপন মনে।

ভাই-বোন কাউকে কখনো চোখে না দেখলেও ওদের ভীষণ ভালোবাসা আমি সব সময় অনুভব করতে পারতাম। ওদের প্রত্যেকের গায়ের গন্ধও ছিল আলাদা। আমি দূর থেকে গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারতাম যে, ভাইয়া আসছে বা কলিমণি দৌড়াচ্ছে। আমার এরকম অদ্ভুত ক্ষমতায় পাড়ার সবাই আমায় বলতো, 'মহিলা দরবেশ'! আমার বড় আপা ভীষণ ভালো গান গাইতে পারতো। মা গান-বাজনা খুব একটা পছন্দ না করলেও বাবার আগ্রহে বড় আপা গানের ওস্তাদের কাছে গান শিখতে শুরু করলো। আপা যখন গান গাইতো তখন আমি আমাদের খোলা বারান্দায় তন্ময় হয়ে আপার গান শুনতাম। আর আমিও মাঝে মাঝে গুনগুন করতাম, 'আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন ভরা...' একদিন আপা আমার গুনগুনানি শুনে ফেললো, 'কীরে তিমা? তুইতো সাংঘাতিক ট্যালেন্ট রে! এত সুন্দর করে গান করিস? দাঁড়া, বাবাকে বলবো তোকেও একটা ওস্তাদজী রেখে দিতে।' কোনো এক অদ্ভুত কারণে আমার সারা শরীরে হঠাৎ একটা শিহরণ বয়ে গেল।

সন্ধ্যে বেলায় সব ভাই বোন পড়তে বসতো। অবশ্য আমি ছাড়া। সবাই যখন পড়তো, সেসময় আমি খোলা বারান্দায় ছোট একটা টুলে বসে মশাদের গান শুনতাম। আমার কেন যেন মনে হতো, মশারাও আপার ঐ 'আলোর' গানটা গাইছে। হঠাৎ তাত্তুটা চীৎকার করে উঠতো, 'তিমা'পা! অ্যাঁই তিমা'পা!! চার তেরং কতরে?'

'বায়ান্ন।'

'তিমা'পা! ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল ইংরেজি কি?'

'জানি না। অমন বাজে ইংরেজি করার কোনো মানে হয়, যেখানে ডাক্তার সময়মতো পৌঁছাতে পারে না?'

আমার কথা শুনে পাশের ঘর থেকে মা খুব বকা লাগাতো, 'আহারে আমার পন্ডিত মেয়ে! কাজ-কর্ম না থাকলে দয়া করে চুপ কর। ওদের পড়তে দে শান্তিতে।' মায়ের কথায় আমি খুব ব্যথা পেতাম। কিন্তু কিছু লতাম না। কারণ অহোরাত্র কষ্টকর কথা হজম করে ওটাই আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

আমি কখনোই বই পুস্তক হাতে নেইনি। আর নিলেও কোনো লাভ নেই। স্বরে 'অ' দেখতে কেমন বা হ্রস্ব 'ই' লিখতে কেমন, তাতো বলার ক্ষমতা আমার নেই। তারপরও আপা-ভাইয়া আর ছোটদের যাবতীয় পড়াগুলো যেন আমি শুনেই আয়ত্ত করে পেলতাম। আমারও খুব ইচ্ছে করতো পড়তে, স্কুরে যেতে। কিন্তু সেটাতো কখনোই সম্ভব নয়।

আপা হাজারো অনুনয় করে বাবাকে আমার গান চর্চার বিষয়ে রাজি করাতে পারলো না। বাবার কথা হলো যে, তিনি রক্ত জল করে যে পয়সা উপার্জন করছেন তাতে আমার মতো অন্ধ মেয়ের 'সারেগামা' করাটা নেহায়েত বাহুল্য ছাড়া কিছুই নয়।

আপার ইন্টারমিডিয়েট পাস করার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। এর আগে অবশ্য আপার আরও দুই জায়াগায় বিয়ের কথা ঠিক ছিল। কিন্তু একজন জন্মান্ধ বোনের অস্তিত্বের কারণে ওরা আমার লক্ষী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন সুস্থ বোনটাকেও

Philips Lighting
PHILIPS
PHILIPS